লোক ঐতিহ্য

লোক ঐতিহ্য

সম্পাদনা ও প্রকাশনা :
ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান,
নির্বাহী পরিচালক,
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন,
সোনারগাঁ, ঢাকা।

গ্রন্থনা :
সৈয়দ মাহবুব আলম,
সহকারী পরিচালক

প্রচ্ছদ, লিপি ও অলংকরণ :
এম, এ, কাইয়ুম,
ডিসপ্লে অফিসার

সর্বস্বত্ব :
ফাউন্ডেশন কর্তৃক সংরক্ষিত

মুদ্রণ ও বাঁধাই :
শেখ ব্রাদার্স অফসেট প্রিন্টার্স
৪৫/১, বি. প্রসন্ন দোদ্দার লেন, ঢাকা-১

মূল্য : টাকা ১২.০০

LOKO-OITHIYYA (FOLK HERITAGE)

EDITED AND PUBLISHED BY
DR. SYED MAHMUDUL HASAN,
EXECUTIVE DIRECTOR,
BANGLADESH FOLK ART & CRAFTS FOUNDATION,
SONARGAON, DHAKA.

PRICE TK. 12.00

দুটি কথা

বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য শুধু প্রাচীনই নয় স্বকীয় বৈশিষ্ট ও আঙ্গিক - রীতি - বৈচিত্র ও অলংকরণে সমুজ্জ্বল। লোকায়ত শিল্প ধারায় লোক সমাজ ও সংস্কৃতির অপূর্ব আলেখ্য ফুটে রয়েছে। লোকশিল্প যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতিচ্ছবি নয় বরং ঐতিহ্য ভিত্তিক 'একাডেমী' রীতি বহির্ভূত স্বতঃস্ফূর্ত, তথাকথিত অশিক্ষিত অথচ দক্ষ গ্রামীন শিল্পীর ব্যক্তি প্রতিভার মূর্ত প্রকাশ। কখনো কখনো প্রতীকী, অলংকরণ - শৈলী এবং রংগের বিন্যাস রসোত্তীর্নই নয়, বংশানুক্রমে সম্প্রসারিত। লোকাচার, লৌকিক বিশ্বাস, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব, উপাদান ও উপকরণের সমন্বয়, প্রাচীন প্রথা ও সংস্কার লোক শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্যের পরিমন্ডল খুবই ব্যাপক। এই ঐতিহ্য লোকায়ত বাংলার সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক পট প্রেক্ষিতে প্রকাশ পেয়েছে। এই শিল্প-সম্ভার বাঙ্গালীর মন-মানসিকতাকে ব্যক্ত করেছে, যেমন — মাটির পুতুল, পোড়া মাটির ফলক, পরা চিত্র, ঘটচিত্র, মুখোশ চিত্র, পট চিত্র, দারুশিল্প, অলংকার, ঢোকরা শিল্প, বাদ্যযন্ত্র, নক্সী কাঁথা, নক্সী পাখা, নক্সী পিঠা, নক্সী পাটি, বাঁশ-বেত, শোলার কাজ, বয়নশিল্প ইত্যাদি। এ ছাড়া রয়েছে চালচিত্র, পুঁথির পাটা, আলপনা, শঙ্খ, খড়ের বাস্তু শিল্প।

আবহমান বাংলার লোক ঐতিহ্য সম্বন্ধে সহজবোধ্য ভাষায় একটি ধারনা দেবার জন্য বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের গ্রন্থচিত্র পুস্তিকা প্রকাশের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আশা করা যায় লোকশিল্পের মূল্যায়নে প্রকাশনাটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করবে।

মাটির পুতুল

ক্ষুদ্র মূর্তিকেই পুতুল বলা হয়। প্রাচীন পুতুলগুলি সভ্যতার নিদর্শন হিসাবে গণ্য হয়। সামাজিক বিবর্তনের সংগে সংগতি রেখে যুগে যুগে পৃথিবীর পুতুলের ব্যবহার, উপকরণ ও গঠনশৈলী ও আকৃতি প্রকৃতির পরিবর্তন হয়েছে। পুতুল অনুকরণ স্পৃহাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অনেক সময় যাদুবিদ্যা, টোটেম, পৌরাণিক ও কাল্পনিক দিক ফুটে উঠে। মূলতঃ পুতুল লোক সংস্কৃতির প্রধান অংগ। সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, পালা-পার্বন, যেমন রথের মেলা, পৌষ সংক্রান্তি, চড়ক পূজা, শিব রাত্রি, মহররম, ঈদ ও বিভিন্ন মেলা ও উরস্ উপলক্ষে কুমোরেরা বিভিন্ন ধরনের পুতুল তৈরী করে। পুতুলের বৈচিত্রময় গঠন ও উজ্জ্বল রংয়ের বিন্যাস শিশুমনকে সহজেই আকৃষ্ট করে।

লোক উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ পুতুল তৈরী করা হয় বিভিন্ন উপাদানে, যেমন কাঠ, মাটি, শোলা, বেত, বাঁশ, কাঁসা, রূপা, তামা, কাপড়, কাগজের মন্ড, পাথর ও মহিষের শিং, চিনি, হাতীর দাঁত প্রভৃতি। সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হচ্ছে মাটির পুতুল। প্রাচীন পুতুলের অনুকরণে কুমোরেরা আংগুল দিয়ে টিপে মাথা চেপ্টা, নাক পাখীর ঠোঁটের মত বস্তু তৈরী করে-এতে হাত বা পায়ের আদল আছে। অংগ-প্রত্যংগ ইংগিতে দেখানো হয়েছে। কখনো কখনো মাটির সুতলী দিয়ে অলংকার বানানো হয়েছে। মাটি ছাড়াও ছাঁচে পুতুল তৈরী করা হয়। বৈশিষ্টপূর্ণ পুতুলগুলিকে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: (ক) দেব-দেবীর মূর্তি: রাধা-কৃষ্ণ, মহাদেব, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গৌর-নিতাই; (খ) মনুষ্যাকৃতি- আহ্লাদি, মা-ছেলে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বর-বৌ, বেয়াই-বেয়ান; (গ) পশুমূর্তি: বাঘ, গন্ডার, হাতী, রুই মাছ, তোতা পাখী, টিয়া।

মাটির পুতুল সর্বক্ষেত্রে পোড়ানো হয়। কখনো কখনো পুতুল লৌকিক দেবতার বা পীরের জন্য উৎসর্গ করা হয়ে থাকে।

পোড়ামাটির ফলক

বাংলার লোক সংস্কৃতির অন্যতম পরিচায়ক পোড়ামাটির ফলক ও অলংকরণ। প্রাচীন কাল থেকে এ দেশে সহজলভ্য মাটি দিয়ে কত কিছুই না তৈরী হয়েছে। বাংলাদেশের পোড়ামাটির ফলকের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় মহাস্থান, ময়নামতি ও পাহাড়পুরে। পরবর্তীকালে মুসলিম আমলে অসংখ্য মসজিদে পোড়ামাটির নকশা স্থাপত্য অলংকরণকে সমৃদ্ধ করেছে। মুসলিম শাসন উত্তর বাংলার অগনিত ইঁটের হিন্দু মন্দিরের ভাস্কর্য লোকশিল্পের ধারাকে অক্ষুন্ন রেখেছে। সাধারণত: ছাঁচের সাহায্যে কাঁচামাটি থেকে ফলক তৈরী করে আগুনে পোড়ানো হয়।

পোড়ামাটির ফলকে সামাজিক জীবনের একটি বাস্তব চিত্র দেখা যায়। নৌকায় ভর দিয়ে দ্বাররক্ষী দন্ডায়মান, কলতলা থেকে রমনীর পানি তোলা, লাঙ্গলবাহী কৃষক, করতাল হাতে নৃত্যরতা নারী, গীতবাদ্যরত পুরুষ, মোরগ ও ষাড়ের লড়াই, নৌবিহার, মৃগয়া, প্রভৃতি। সামাজিক ছাড়া পৌরানিক ও লৌকিক কাহিনী অবলম্বনে মন্দিরে পোড়ামাটির সজ্জা দেখা যায়।

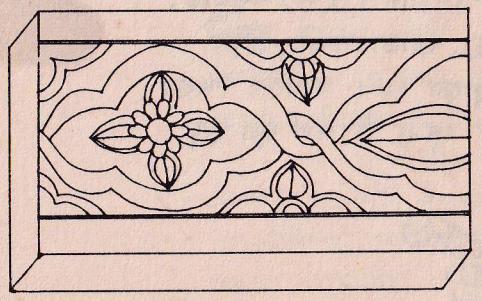

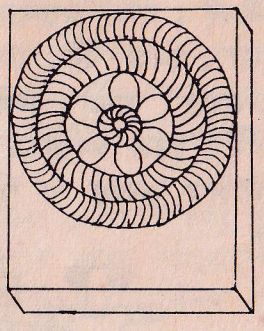

সরা চিত্র

গ্রাম বাংলায় সরাচিত্র বলতে লক্ষীসরাকে বোঝায়। হিন্দু সমাজে লক্ষীপূজায় ব্যবহৃত সরাচিত্র ছাড়া সরায় কখনো কখনো দুর্গা ও রাধা-কৃষ্ণের যুগল-মূর্তি আঁকা দেখা যায়। সরার ব্যবহার সাধারণতঃ ঘরের ভিতরে লক্ষীপূজার দিন দেবীপটকে পূজা করার জন্য। পূজার পর অলংকরণ হিসাবে সেগুলি শোভা পায়। ঢাকাওফরিদপুর জেলায় লক্ষীসরার প্রচলন বেশী দেখা যায়। গ্রামীন চিত্রকর তুলির সাহায্যে মোটা আঁচড় দিয়ে সরার বাইরের কনভেকস দিকটার ছবি আঁকেন। সরা ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের হয়, ব্যাস ১০"থেকে ৩০" পর্যন্ত। প্রথমে সরার উপর লম্বা দাগ টেনে কয়েকটি ভাগ করে দেওয়া হয়; তারপর লক্ষীর ছবির মাঝখানে আঁচলের নিচে প্যাঁচা, ধানের শিষ, বাড়ি ইত্যাদি আঁকা হয়। মুখের আদলে পটচিত্রের বা চালচিত্রের শিল্পরীতির প্রভাব দেখা যায়। পটে দুর্গা ও রাধাকৃষ্ণের মূর্তিও থাকে।

মুসলিম সমাজেও চিত্রিত সরার রেওয়াজ আছে। তবে তা ফুল ও লতা পাতায় শোভিত যেমন গাজীর সরা, মহররমের সরা প্রভৃতি।

ঘট চিত্র

আজো বাংলাদেশের গ্রাম গুলোতে লোক মেলায় নানা গড়নের বৈচিত্রময় রং ও রেখাপূর্ণ মাটির তৈরী ঘট পাওয়া যায়। মূলতঃ কুমারের তৈরী ছোট আকারের কলসের আদলেই এই ঘট তৈরী করা হয়। তবে ঘট চিত্রের বৈশিষ্ট আনতে গিয়ে কুমার সাধারণ ঘট বা ছোট কলসের গড়নের মধ্যেই কিছু লৌকিক দেবদেবীর মূর্ত্তি সৃষ্টি করে থাকে, পরে তুলির আঁচড়ে নানা রংগে প্রতিমা ফুটিয়ে তোলা হয়।

এ সব চিত্রময় ঘট যদিও অপদেবতা ও অমংগল হরার্থে গ্রামে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তথাপি লোক শিল্পের বিচারে এর গড়ন, রং ও বৈচিত্র মন হরণ না করে পারে না।

বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ঘটের ব্যবহার হয়ে থাকে। পূজা ভেদে এর নামও ভিন্ন ভিন্ন, ফলে নির্দিষ্ট পূজার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি ঘটে আঁকা হয়। অষ্টনাগ ঘট, মংগল ঘট, মনসা ঘট, নাগ ঘট, লক্ষী ঘট এবং শীতলা ঘট এর মধ্যে অন্যতম।

মুখোশ চিত্র

বাংলাদেশের গ্রাম গুলোতে আজও নানা লোকজ ধর্মীয় আচারমূলক অনুষ্ঠানাদিতে নৃত্য ও অভিনয়ের রীতি আছে। এসব অভিনয়-নৃত্য, লৌকিক দেবদেবীর আচরণ বিষয়ক এবং লোক জীবনের মঙ্গলামঙ্গল চেতনা সম্পর্কিত। এসব অভিনয় ও নৃত্যে মুখোশের ব্যবহার হয়ে আসছে। যেমন: চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবনৃত্যে ও কালীনৃত্যে শিব ও কালীর মূর্তির অনুকরণে মুখোশ লাগিয়ে নৃত্য করা হয়। গম্ভীরা গানেও মুখোশ ব্যবহৃত হয়।

লোকজ আচার-অনুষ্ঠানে, লোকনৃত্যে মুখোশের ব্যবহারের মূলে রয়েছে আবহমান গ্রাম বাংলার নরনারীর নানা অভিব্যক্তি যেমন: বীরত্বব্যঞ্জক, করুণভাব বা সম্মোহন ভাবের প্রকাশ। এ ছাড়া নানা কুপ্রভাব দূরীকরণে লোক সমাজের যুগ যুগান্তরের সংস্কার ও বিশ্বাস অনুযায়ী (ম্যাজিক) আচার অনুষ্ঠানেও বিভিন্ন লোকজ নৃত্যে মুখোশের ব্যবহার রয়েছে।

কাঠ, মাটি, কাপড় এবং লাউয়ের খোলের তৈরী মুখোশ দেখা যায়। মুখোশে ব্যবহৃত রংয়ের মধ্যে লাল, হলুদ, নীল এবং কালোই প্রধান। মুখোশ তৈরীর পদ্ধতি খুবই সহজ—প্রথমে মুখোশের 'পেটা' তৈরী করে নিতে হয় মাটি দিয়ে একটি কাঠের পাটার উপর। তারপর হাতে টিপে যে চরিত্রের মুখোশ হবে তার মোটামুটি আদলটি ফুটিয়ে তোলা হয়।

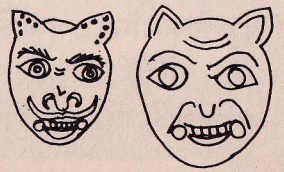

পটচিত্র

নদীমাতৃক প্রকৃতি, গ্রাম এবং লোকসমাজের হাসিকান্না, সুখ, দুঃখ ও আশা-আকাংখা নিয়েই বাংলাদেশ। এইসব নিয়েই লোকজ চিত্র। লোক-মানুষ আবহমান কাল থেকে ব্যক্তি মনের প্রকাশ হিসাবে বা পৌরাণিক কাহিনী ভিত্তিক নানা আখ্যান ছন্দে, গানে ও চিত্রে প্রকাশ করে আনন্দিত হয়েছে।

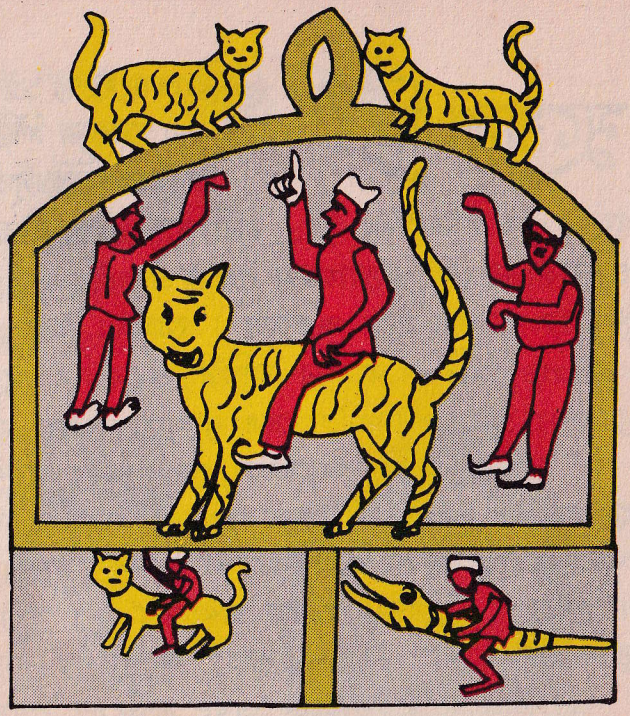

পটচিত্র মূলত: গ্রামের লোকজ চিত্র। এসব শিল্পীরা পটুয়া হিসাবে পরিচিত। তারা সুতি কাপড়ে রং দিয়ে দীর্ঘ চিত্র আঁকে। কাহিনীর পারম্পর্য রক্ষার জন্য পরপর ছবি সাজিয়ে নেয়া হয়। ফলে পটচিত্র বেশ দীর্ঘ হয় ও জড়ানো অবস্থায় থাকে। এগুলো দশ থেকে কুড়িহাত পর্যন্ত হয়ে থাকে। পঞ্চাশ দশকেও পটুয়ারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে পটচিত্র, ছড়া, গান ও নৃত্যের সাহায্যে বর্ণনা করে জীবিকা নির্বাহ করত। বাংলার পটের বৈশিষ্ট এর সরল ও লীলায়িত রেখা। রং, রেখা ও সুদক্ষ বর্ণনা ভংগি বাংলার পটচিত্রকে নিজস্ব স্বাতন্ত্র দিয়েছে।

কাহিনীর বিষয় ছিল পৌরাণিক আখ্যায়িকা - রামলীলা, কৃষ্ণলীলা, শিব-পার্বতী, গৌর-লীলা, শকুন্তলা ইত্যাদি। লৌকিক পাঁচালী এবং পালাগানও পটচিত্রে দেখা যেত। ময়মনসিংহের হিন্দু পৌরাণিক পটচিত্র বিখ্যাত। এছাড়া বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের গাজীর পট বাংলার পটচিত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। বর্তমানে এশিল্প বিলুপ্তির পথে।

দারুশিল্প

বাংলাদেশের আর্দ্র আবহাওয়ায় কাষ্ঠের প্রাচীন নিদর্শনাদি রক্ষা না পেলেও দারুশিল্প যে এককালে খুবই সমৃদ্ধ ও বৈশিষ্টপূর্ণ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। গীতি কাব্যে এর উল্লেখ আছে।

"কাঁঠাল, পিয়াল, শাল, তাল।
গাম্ভারী তাম্বাল বহু, নখে চিরে দিল বহু, দারু ব্রহ্মা গাড়য়ে গজাল।"

লোকজীবনের প্রতিফলন এখনও দেখা যাবে লোকশিল্পের অসংখ্য অপূর্ব নকশাকৃত খাট, পালঙ্ক, খেলনা পুতুল, রথ, নৌকা, ডুলী, দোলা, জলচৌকি, পিঁড়ি, সিন্দুক, ঘটি, বাটি, কৌটা, বেড়া, ঝাঁপি, দরজার কপাট, বিগ্রহ, চড়ক, চন্ডীমন্ডপ চতুর্দোলা, চাকাওয়ালা হাতী, ঘোড়া, লক্ষীর ঝাঁপি, বারকোশ প্রভৃতিতে। এ ছাড়া রয়েছে কাষ্ঠ খোদাই এর অসংখ্য প্যানেল যাতে হিন্দু ও বৌদ্ধ পৌরাণিক কাহিনী সযত্নে উৎকীর্ন রয়েছে। অপূর্ব নৈপুন্যের সংগে লোকশিল্পী এক টুকরা কাষ্ঠকে নৌকার ঈগলাকৃতি গলুইয়ে রূপান্তরিত করেছেন।

সোনারগাঁয়ে প্রস্তুত রংগীন চাকাওয়ালা বড় আকারের উৎকৃষ্ট মানের হাতী, বাঘ ও ঘোড়া খেলনা বৈশিষ্টপূর্ণ লোকজ শিল্পের ধারাকে অক্ষুন্ন রেখেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরণের লতাপাতা, জ্যামিতিক নকশার সমাবেশে বরের পিঁড়ি, বিভিন্ন ভংগীমা ও বৈচিত্রের প্রতীক রংএর পুতুলের খোদিত অংশ, বিগ্রহ মূর্তি, পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে খোদিত কাষ্ঠ দারুশিল্পীর দক্ষতা ও অনুপম সৌন্দর্য বোধের পরিচায়ক। এ ছাড়া রয়েছে 'মমী' পুতুল। এ সমস্ত পুতুল গলা ও কোমরের দু-পাশে সামান্য কুঁদে এবং দুপাশে অর্ধবৃত্তাকারে উঁচে পোষাক পরা নারী পুরুষের আদল দেওয়া হয়।

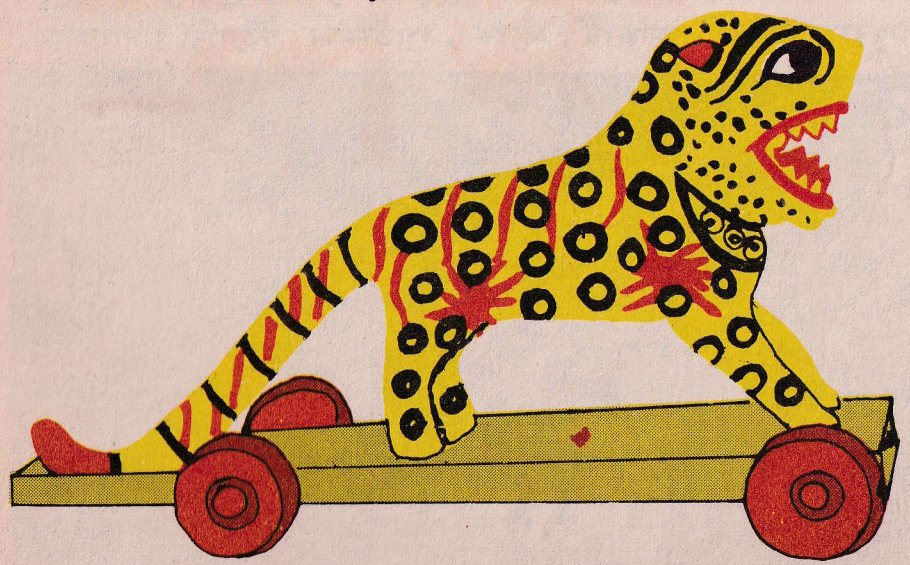

অলংকার

বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্যে অলংকারের ব্যবহার এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। সবুজ প্রকৃতি ও নদনদীর দেশ বাংলাদেশের মেয়েদের অলংকারের প্রতি আকর্ষণ প্রাচীন কাল থেকে আজ অবধি অব্যাহত রয়েছে। লোকজ অলংকারের গড়নে ও উপকরণের ব্যবহারে বৈচিত্র্যময় স্বাদ পাওয়া যায়। প্রথম অবস্থায় মাটি, কড়ি, শঙ্খ, লাক্ষা, কাঁচ, তামা, লোহা, ফলের বীজ, পুঁতি দিয়ে অলংকার গড়া হতো। বহু পরে পিতল ও রূপা দিয়ে অলংকার তৈরীর প্রচলন হয় এবং আজও তা গ্রামে প্রচলিত আছে। আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশে মেয়েদের অলংকার প্রীতি কেবল সৌন্দর্য বোধকেই প্রকাশ করেনা, লোকাচার ও ধর্ম বিশ্বাসে এর বিরাট প্রভাব রয়েছে।

লোক অলংকার ব্যবহারের ধারার উপর এর নামকরণ হয়েছে যেমন : হাতের জন্য-বায়লা, বেতল, রুংফুল, কংকন, রাউ, বালা, পৈছি, রুলি, গুড়, চুড়ি; গলার জন্য - হাঁসুলী, মাদুলী, হার, তাবিজ, পাঁচনরী, সাতনরী, অর্ধহার ; বাহুর জন্য - তাগড়া বাজু, কাঁটাবাজু, অনন্ত, টইটি, কালসী, পঞ্চকা ইত্যাদি; কোমরের জন্য - বিছা, তারাহার, চন্দ্রহার, কোমরদানী, গোট, কোমরজোর, ইত্যাদি; কানের জন্য - কানফুল, মাকড়ী, কানপাশা, ঝুমকা, টপ, মকর, কানবালা, পাশিয়া ইত্যাদি; পায়ের জন্য - খাড়ু, ব্যাঁকখাড়ু, মল, বাজামল, মল্লতোড়, নুপুর, পাহুরা, পঞ্চম, আঙ্গটি, ব্যাঁক, পাতামল ইত্যাদি; নাকের জন্য - নথ, নোলক, বোলাক চামকবালি, নাকছাবি, নাকমাছি, বিজলী, ফুল, নাকফুল; কপাল ও মাথার জন্য - সিঁথি অলকা, সিঁথি পাটি, শিরবন্দী, চৌবন্দী ইত্যাদি।

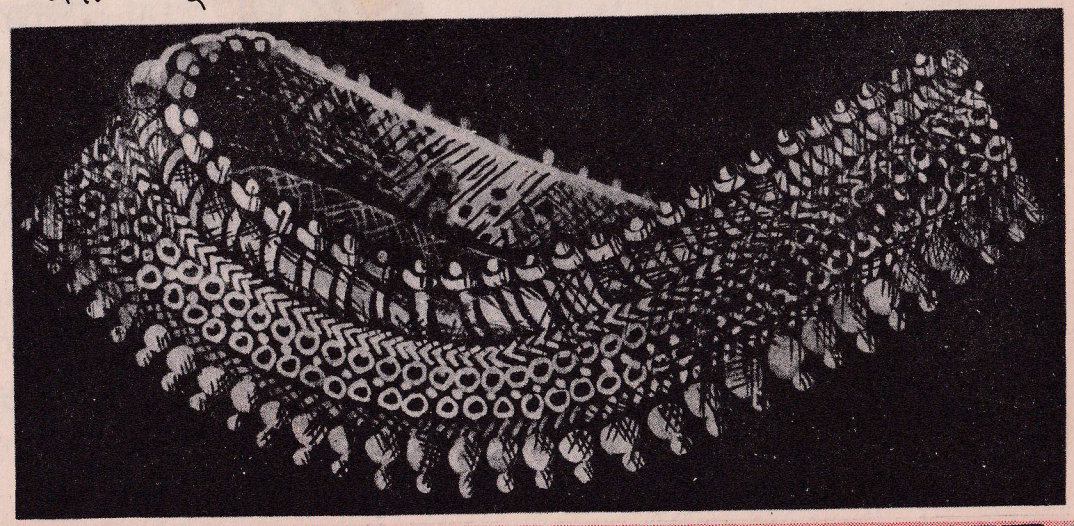

তামা-কাঁসা-পিতল

দৈনন্দিন ব্যবহারে উপযোগী তামা, কাঁসা ও পিতলের দ্রব্যাদি গ্রামের ব্যবহারিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

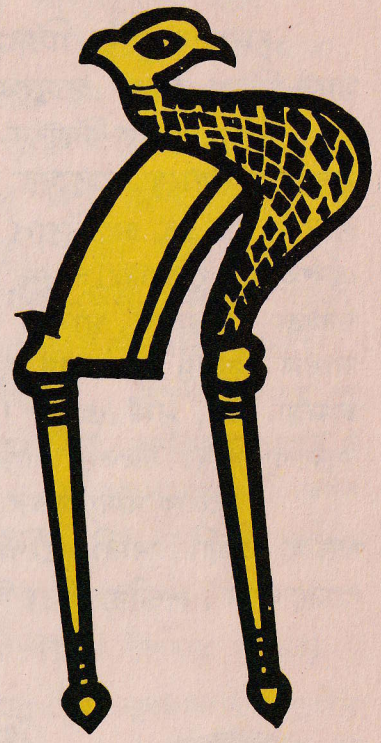

এ ছাড়াও রয়েছে লোকজ বিশ্বাস ও ধর্ম বিষয়ক নানা মূর্তি ও পাত্র।

মূলতঃ মাটির হাড়িকুড়ি, বাটি, বাসন ও কলসের গড়নেই পিতল ও তামা-কাঁসায় অনুরূপ তৈজসপত্র তৈরী করা হয়। এসব ধাতু উত্তাপে গলিয়ে মাটি ও মোমের ছাঁচের মাধ্যমে ও পাত পিটিয়ে কারিগরগণ বিভিন্ন জিনিষ-পত্র ও মূর্তি পুতুল গড়ে।

মৃৎশিল্পের চিরায়ত গড়নের অনুকরণে তামা, কাঁসা ও পিতলের তৈজসপত্র তৈরী হলেও কঠিন ধাতুতে যে ধরণের অলংকরণ স্বাভাবিক তাই বিচিত্রভাবে কারিগরগণ ফুটিয়ে তুলেছেন। এসব অলংকরণ প্রকৃতির লতাপাতা ও জ্যামিতিক নক্শা কেন্দ্রিত। এ ছাড়া লৌকিক দেবদেবীর চিত্র বা মূর্তি ও রয়েছে।

তামা, কাঁসা ও পিতলের জিনিষ পত্রাদির মধ্যে রয়েছে, হাঁড়ি, বদনা, বাটি, গ্লাস, পানদান, হুক্কাদানী, থালা, কুলা, চামচ, চালনি, সাদুর, রুটি বেলার বেলুন, গাড়ু, ঢাল, রাম্দা, নারিকেল কুড়ানী, দেবদেবীর মূর্তি, জীব জন্তুর খেলনা, পুতুল ইত্যাদি।

ঢাকার ধামরাই, টাঙ্গাইলের কাগমারী, জামালপুরের ইসলামপুর ও দারিয়াবাদ এবং রাজশাহীর নওয়াবগঞ্জ ও **আরিদুর** অঞ্চলের তামা, কাঁসা ও পিতলের নানা গড়নের অলংকৃত তৈজসপত্র, মূর্তি ও পুতুল বিশেষ প্রসিদ্ধ।

বাদ্যযন্ত্র

লোকসংগীত চিরায়ত শিল্প। এ শিল্প বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্য, যাতে মিশে আছে মানুষের মনের কথা, প্রাণের স্পর্শ আর হৃদয়ের আর্তি, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, প্রেম-ভালবাসা। লোক সংগীতের বাণী, সুর ও তারের টংকারে মানুষের অন্তরের ভাষা ঝংকৃত হয়ে উঠে। এই লোক সংগীত গান ও তানের সংমিশ্রন। লোকবাদ্যযন্ত্র সাধারনতঃ চার প্রকারের; তার যন্ত্র- একতারা, দোতারা, সারঙ্গ ইত্যাদি; ফুৎকার যন্ত্রে— বাঁশী, শঙ্খ ইত্যাদি; ঘনযন্ত্র— করতাল, মন্দিরা ইত্যাদি; আনদ্ধ যন্ত্র— ঢোল, ঢাক, দুগদুগি, খোল, মাদল ইত্যাদি। এসমস্ত বাদ্যযন্ত্র বিভিন্ন উপকরণে তৈরী হয় যেমন: মাটি, কাঠ, চামড়া, বাঁশ, লাউ, প্রভৃতি। বৈচিত্রপূর্ণ নক্শা ও নানা ধরণের বাদ্যযন্ত্র গ্রামীন কারুশিল্পীদের দক্ষতার পরিচায়ক।

লোক বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার লোক সংগীতকে করেছে সমৃদ্ধ। ফলে সৃষ্টি হয়েছে জারী, সারী, মুর্শিদী, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, কবিগান, বাউল, কীর্তন, পালাগান, গম্ভীরা ইত্যাদি।

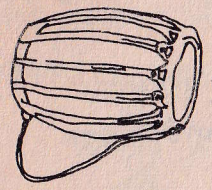

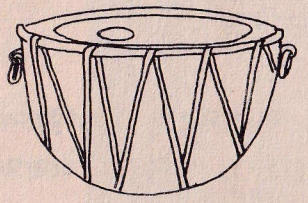

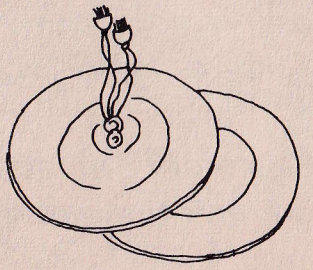

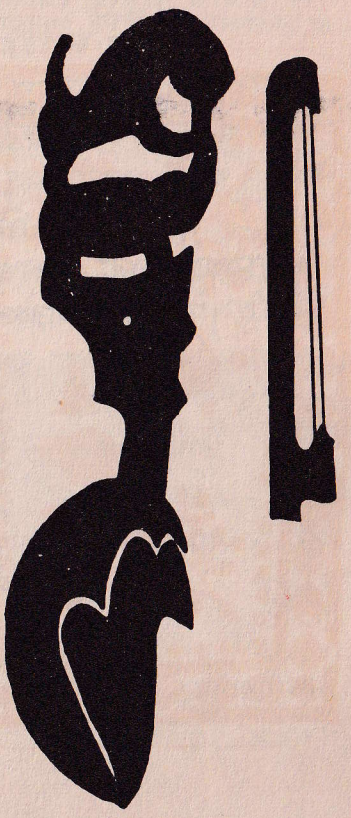

নক্‌শী কাঁথা

বাংলাদেশের গ্রামীন লোকজীবনের সাংস্কৃতিক রূপ-বৈচিত্রের সৃজনশীল বিকাশ ঘটেছে নক্‌শী কাঁথায়। আবহমান কাল থেকে পল্লী বাংলার মেয়েরা জীবনের প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে তাদের দক্ষতা দিয়ে অপরূপ নক্‌শী কাঁথা তৈরী করেন। একাধিক পুরাতন কাপড়ের টুক্‌রা পাট করে একখানার উপর আর একখানা রেখে অবিচ্ছিন্নভাবে সেলাই করেই সৃষ্টি হয় কাঁথার। শাড়ীর পাড় থেকে নেয়া রঙীন সুতা দিয়ে চার পাশের প্রকৃতির অতি রচনা ফুল, ফল-লতা-পাতা, পশু-পাখী, মানুষের মটিফ ও জ্যামিতিক নক্‌শার ব্যবহারে একটি সাধারণ কাঁথাকে রূপান্তরিত করা হয় নক্‌শী কাঁথায়। নক্‌শী কাঁথায় যে সমস্ত মটিফ দেখা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অষ্টদল, শতদল ও সহস্রদল পদ্ম, চড়কা, স্বস্তিকা, জীবন বৃক্ষ, রথ, রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি। কেবল মাত্র ব্যবহারিক দিকই নয়, নক্‌শী কাঁথায় বিধৃত হয়েছে দেশের সামাজিক রূপ-বৈচিত্র, তথা সামাজিক, ধর্মীয় ও লোকজ বিশ্বাস।

আবহমান কাল থেকে আজ অবধি নক্‌শী কাঁথার ব্যবহার বাংলাদেশে অতি সুপরিচিত, এর বৈচিত্রপূর্ণ ও সুষমামন্ডিত ব্যবহার দেখা যাবে, সুজনী কাঁথা, লেপ কাঁথা, রুমাল কাঁথা, বর্তন ঢাকনী, পান প্যাচনী, দস্তরখান, আরশীলতা, বালিশের ঢাকনা, আসন কাথা, কোরান শরিফের গিলাফ ও বটুয়া প্রভৃতিতে। ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও কুষ্টিয়া অঞ্চল নক্‌শী কাঁথার জন্য বিখ্যাত।

নক্‌শী পাখা

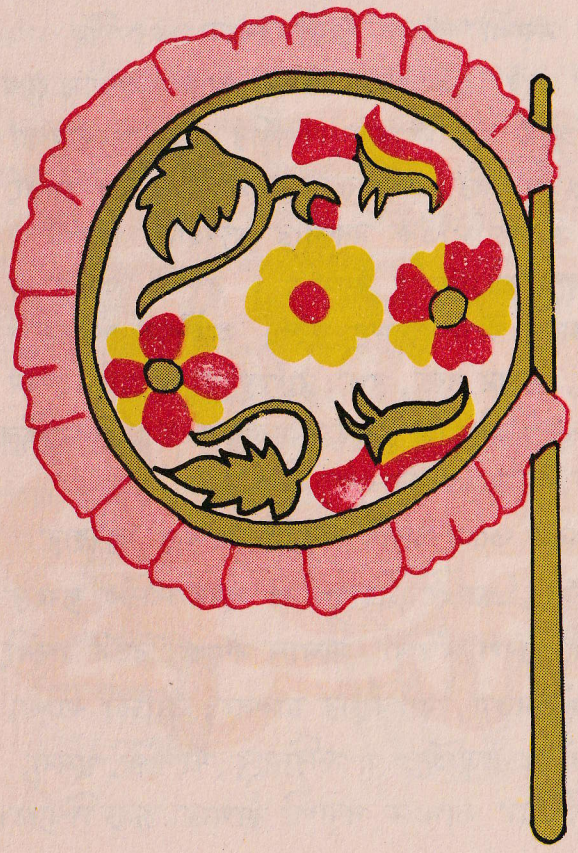

নক্‌শী কাঁথার মত নক্‌শী পাখাও বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই খুব জনপ্রিয় ও বৈশিষ্টপূর্ণ । গ্রাম বাংলার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে নক্‌শী পাখার বহুল প্রচলন রয়েছে । গ্রামের মেয়েরাই নক্‌শী পাখার শিল্পী । শন, বাঁশ, বেত, কোলা, কাপড়, তাল ও খেজুরের পাতা প্রভৃতি দিয়ে পাখা তৈরী হয় । বিভিন্ন ধরণের নক্‌শা ও নানা আকারের পাখার বিভিন্ন নামকরণ রয়েছে । সুতার তৈরী পাখা: শঙ্খলতা, তারাফুল, বলদের চোখ, সাগরদীঘি; বাঁশের পাখা : গুলপাতা, তারাফুল, ছিটাফুল, কাঁকইর মালা, ভালোবাসা, নলখাগড়া, হাতী-মানুষ-ফুল ; বেতের তৈরী পাখার মধ্যে পালংপাষ এবং পাশার দান উল্লেখযোগ্য । দৈনন্দিন জীবনের সুপরিচিত নানা বস্তুর দৃশ্য এই পাখায় বোনা হয় । বিভিন্ন ধরণের ফুল-লতাপাতা, জ্যামিতিক নক্‌শা, মানুষ পশুপাখী, চাঁদ-তারা ছাড়াও প্রচলিত নীতি কথা, ছড়া, প্রবাদও দেখা যাবে নক্‌শী পাখায়।

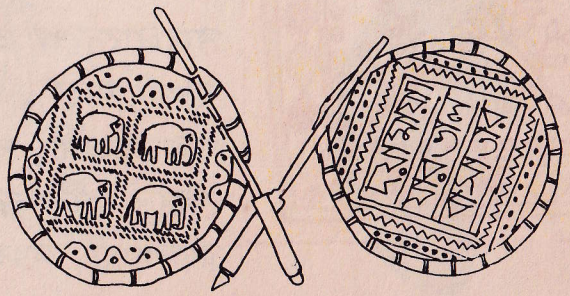

নক্‌শী পিঠা

নক্‌শী পিঠা আবহমান বাংলার লোক সংস্কৃতির একটি বিশেষ অংশ হিসাবে স্বীকৃত। পূজা, পালা-পার্বণ, বিবাহ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে যে মুখরোচক পিঠা পরিবেশন করা হয় তার মধ্যেও শিল্প চেতনা রয়েছে। সহজলভ্য উপাদানে তৈরী করা হয় মুখরোচক লোক পিঠা, যেমন চাল, গুড়, তেল, নারিকেল দুধ, খেজুরের রস ইত্যাদি। এই পিঠা তৈরী হয় মাটির বিভিন্ন ধরণের ছাঁচে। এই সব ছাঁচের আকার হয় প্রায়ই জ্যামিতিক, বর্গাকার, ফালি, ত্রিকোণ, বৃত্ত ও অর্ধচন্দ্র। আবার কোন-কোনটির আকৃতি হয় নানা ধরণের ফল বা বস্তুর মত; যেমন, মাছ, লিচু, আনারস, আতা, শঙ্খ, ময়ূর, ঘোড়া ইত্যাদি।

পিঠার বিভিন্ন নাম রয়েছে যেমন; পাকোয়ান, পুলি, ফুল, ক্ষীরপুলি, সন্দেশ, চন্দ্রপুলি, সরভুরিয়া। গ্রামের মেয়েদের শিল্পবোধের পরিচায়ক নকশী পিঠাতে কখনও কখনও সদ্‌বাক্য উৎকীর্ণ থাকে, যেমন 'সুখে থাকো', 'শুভবিবাহ', 'ফুল শয্যা' ইত্যাদি।

নক্‌শী পাটি

নক্‌শী পাখার মত নক্‌শী পাটি খুবই আকর্ষণীয়। বেতের সরু খিল বা বাঁশের চিকন বেতা বা নলখাগড়া দিয়ে পাটি তৈরী হয়। বাংলাদেশের প্রায় সবত্রই পাটি তৈরী হয়। তবে সিলেট অঞ্চলে মুতরা দিয়ে তৈরী পাটি বৈশিষ্টপূর্ণ। জড়জগত ও জীবজগতের ছবি নক্‌শী পাটিতে বোনা হয়ে থাকে। যেমন গাছপালা, লতাপাতা, পশুপক্ষী, জ্যামিতিক নক্‌শা, এছাড়া পাটিতে দক্ষতার সংগে যে সমস্ত নক্‌শা বোনা হয় তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মসজিদ, মিনার, পালকী, নৌকা, কাঁকই, হাঁড়ি, হাঁস, কবুতর, হাতী, ঘোড়া, বাঘ, হরিণ।।

পাটি বিছানার আসন, জায়নামাজ, খাবারের আসন, বরের আসন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সিলেট কুমিল্লা, নোয়াখালী জেলায় মুতরা নামক বেতের চিকন ও মসৃণ খিল দিয়ে তৈরী পাটিকে বলা হয় 'শীতল পাটি'। নক্‌শী পাটি ঘরের বেড়া ও ছাদেও ব্যবহৃত হয়। নানা রংএর ব্যবহারে নক্‌শী বোনা হয়। খুলনা জেলায় মসলন্দ নামে এক উন্নত ধরনের পাটি পাওয়া যায়।

বাঁশ ও বেত

বাংলাদেশের আর্দ্র জলবায়ুতে প্রচুর পরিমানে উৎপাদিত বাঁশ ও বেতের বিভিন্ন দ্রব্যাদি গ্রামীন জীবনের অপরিহার্য সম্পদ। সহজলভ্য বাঁশ দিয়ে প্রাচীন কাল থেকে দোচালা ও চারচালা ঘর তৈরী হয়ে আসছে। বাঁশ দিয়ে তৈরী করা হয় বেড়া, ঝাঁপ, চটি, বাখারি। এছাড়া ফলের সাজি, নৌকার ছই, গরুর গাড়ীর ছই, কৃষকের মাথাল, মাছ ধরার সরঞ্জাম, পাখীর খাঁচা, ডালা, ঝুড়ি, চালনী, ধামা, লাঠি ইত্যাদি বাঁশ দিয়ে বানানো হয়।

কাঁটাযুক্ত বেতলতা সিলেট অঞ্চলে প্রচুর জন্মে। অতিশয় নরম থাকায় বাঁকা করে নানা ধরণের আকর্ষণীয় তৈজসপত্র ও আসবাব পত্র তৈরী করা হয়, যেমন, ধামা, সাজি, ঝুড়ি, লাঠি, চেয়ার, মোড়া, বাক্স পেটারা, ছাতার বাঁট ইত্যাদি। বেতশিল্পী অসামান্য দক্ষতায় সূক্ষ্ম জালীর পর্দা ও নক্সী আসন তৈরী করে থাকেন।

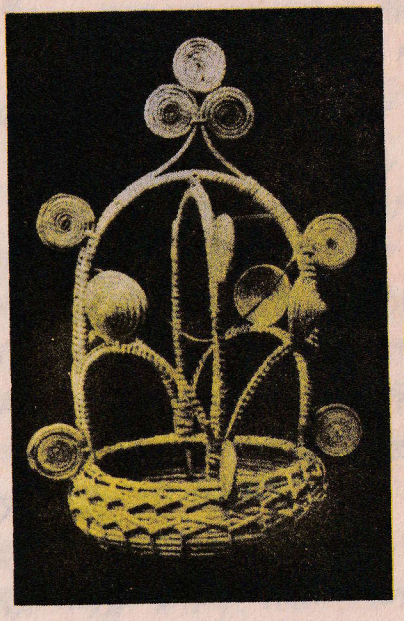

শোলা

এখনো গ্রামের মেলা, হাটে, বাজারে শোলার খেলনা পুতুল নিয়ে মালাকাররা পসরা সাজায়। শিশুদের মনোহরণকারী শোলার পুতুল ও খেলনা নানা আকার ও বর্ণের হয়ে থাকে।

জলা ও নীচু এলাকায় যেখানে সারা বছর পানি জমে থাকে, সেখানে প্রচুর শোলা জন্মে। বাংলাদেশের সর্বত্রই কমবেশী শোলা পাওয়া যায়। এই শোলা ভাট শোলা নামেই পরিচিত।

মালাকাররা ভাট শোলা থেকে নানা খেলনা, পুতুল ও হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়ের বর ও বধূর মাথার টোপরও তৈরী করে।

শোলার বাইরের আবরণ ফেলে দিয়ে ভিতরের নরম অংশ নানা আকারে কেটে আঠা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে কখনো ফুল, ফল, লতা, কদম্ব, পাখী, টোপর, পাখা, মাথার হ্যাট, ইত্যাদি তৈরী করা হয়। এতে নানা রং দিয়ে মোটা রেখার সাহায্যে অলংকরণ করা হয়।

এসব খেলনা বা পুতুলে লৌকিক দেব-দেবীর আদলও ফুটিয়ে তোলা হয়। পুতুলে মালাকাররা সমাজের ব্যাংগাত্মক নানা চরিত্র তুলে ধরে থাকে এবং পুতুল নাচেও শোলার তৈরী প্রতিকৃতির ব্যবহার বহুল প্রচলিত।

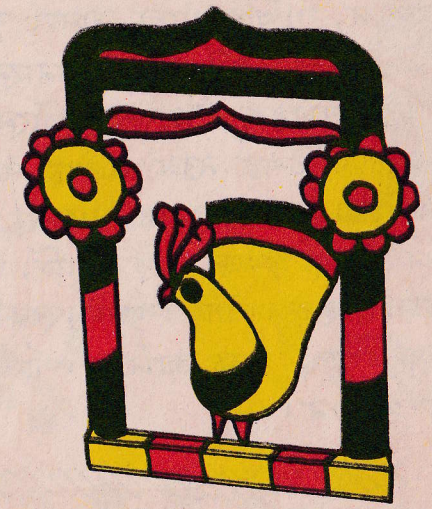

মসলিন

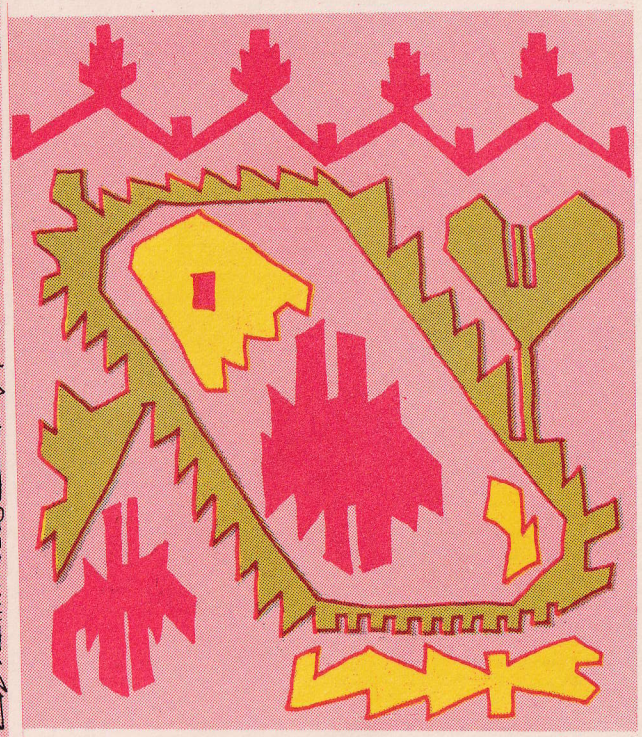

"ঢাকাই মসলিন ঘাসের উপর পাড়িয়া রাখিলে ও রাত্রিতে উহার উপর শিশির পড়িলে, কাপড় দেখাই যাইত না। একটা আংটির ভিতর দিয়া এক খানা মসলিন অনায়াসেই টানিয়া বাহির করিয়া লওয়া যাইত"।

অতি উৎকৃষ্ট কার্পাস তুলার সূক্ষ্ম সুতা দিয়ে তৈরী সুপ্রসিদ্ধ মসলিন বাংলাদেশেরই গৌরব। বর্তমানে মসলিন আর তৈরী হয়না। বৃটেন, জার্মান, কোলকাতা ও ঢাকা যাদুঘরে মসলিনের নিদর্শন সংরক্ষিত আছে।

তবে মসলিনের ঐতিহ্য বিলুপ্ত হলেও, এর ক্ষীন ধারা জামদানী আজও বাংলাদেশে টিকে আছে। আবরোয়া, ঝুনা, সরবতি, সওগাতি, সরকার আলী, শবনম, মলমল খাস, আলবল্লা, তনজেব, তরন্দাম, নয়নসুখ, সরকন্দ, তুরিয়া, জামদানী আরো কত-রকমেরই না মসলিন তৈরী হতো।

নক্সার পার্থক্য অনুযায়ী নাম ছিল - বুটিদার, তেরছা, পান্নাহাজার, দুরিয়া ইত্যাদি। একমাত্র ঢাকা জেলায় এই মসলিন তৈরী হতো। বাবুর হাট, তারাবো, ডেমরা ও নোয়াগাড়ার জামদানী ঢাকাই মসলিনের সাবেকী ঐতিহ্যের ক্ষীন ধারাকে বর্তমানে কোন রকমে টিকিয়ে রেখেছে।

পান্নাহাজার, ছাওয়াল, করোলা, দুবলীজাল, ডরিয়া, তেরছা এবং আমছাপ জামদানী কাপড়ে অতি প্রচলিত নক্সা হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সোনারগাঁ অঞ্চল এক সময়ে মসলিনের জন্য বিখ্যাত ছিল।